এখন রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

EKHON RABINDRANATH

A collection of essays on Rabindranath

Edited by Susanta Pal

First Published
May, 2026

ISBN 978-81-7572-274-3

Price ₹ 575

প্রথম প্রকাশ
পঁচিশে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দাম ₹ ৫৭৫

প্রচ্ছদ: আর্ট ক্রিয়েশন

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনও অংশ কোনও মাধ্যমে কোনোরকম পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা আইনত দণ্ডনীয়।
প্রবন্ধের যাবতীয় বক্তব্য একান্তই প্রাবন্ধিকের নিজস্ব।

সূচি

আবার কেন রবীন্দ্রনাথ?		৯

প্র ণি ধা ন

সভ্যতার সংকট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫

পূ র্ব-প ক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২২
রবীন্দ্রনাথ: রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভবতোষ দত্ত	৪৯
রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ	ক্ষুদিরাম দাস	৫৭
মার্কসের দিকে	প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য	৭৭
রবীন্দ্র-বিশ্বদৃষ্টি: মানুষের ধর্ম	সৈয়দ আবুল মকসুদ	১০৬
আধুনিক ভারত-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ	বীতশোক ভট্টাচার্য	১২০

উ ত্ত র-প ক্ষ

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য: একটি বিচার-বিশ্লেষণ	শোভনলাল দত্তগুপ্ত	১৩৭
আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা: রবীন্দ্রনাথ	অভ্র ঘোষ	১৪৮
রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ‘পাব্লিক’, সমাজশক্তি/ সমাজতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিক ভারতে ও আজকে পুরসমাজ	অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়	১৫৭
রবীন্দ্রনাথের ‘শান্তিনিকেতন ল্যাবরেটরি’ ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা	অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭২
গ্রামীণ মানুষের স্ব-ক্ষমতা: রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন: রবীন্দ্রনাথের পল্লিসমাজ গঠনের কর্মোদ্যোগ ও বর্তমান ভারত	স্বপন মুখোপাধ্যায়	১৯৩

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' ও বর্তমান ভারত: স্বদেশপ্রেম ও উগ্র-জাতীয়তা প্রসঙ্গ	দেবনারায়ণ মোদক	২১১
রবীন্দ্রনাথ: জাতীয়তাবাদের 'গান্ধি-যুগে'	শিবাজীপ্রতিম বসু	২২৬
বিশ্বমানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ	সুস্নাত দাশ	২৪২
রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বক্তৃতামালা ও আজকের ভারতবর্ষ	দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৬
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে... রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে একটি আলোচনা	বিপ্লব নায়ক	২৬৪
নিম্নবর্গের রবীন্দ্রনাথ	শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৭
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংকট ও রবীন্দ্রনাথ	পার্থসারথি হাটি	২৯৭
বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা: প্রসঙ্গ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড	রাহুল রায়	৩১১
রবীন্দ্রনাথ: বাউল, লোকায়ত দর্শন ও আজকের সময়	মোহাম্মদ শেখ সাদী	৩২৮
রবীন্দ্রভাবনায় নারীমুক্তি: দ্বন্দ্ব, বিবর্তন ও উত্তরণের জটিল পথ	সুশান্ত পাল	৩৩৭
শিক্ষার মুক্তধারা	পার্থ সারথি বণিক	৩৫৯
রবীন্দ্রনাথের ছবি: কিছু ভাবনা, কিছু জিজ্ঞাসা	সুশোভন অধিকারী	৩৭২
রবীন্দ্রনাথের মিডিয়া, মিডিয়ার রবীন্দ্রনাথ	অঞ্জন বেরা	৩৮১
গানের ভিতর দিয়ে	শুভাশিস ভট্টাচার্য	৩৯৮
উত্তর-অবয়ববাদী বিচার-পদ্ধতি এবং সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ	সঞ্জীব দাস	৪১১
আজকের আত্মঘাতী শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথ	সুশান্ত পাল	৪২২
লেখক পরিচিতি		৪৩৩

আবার কেন রবীন্দ্রনাথ?

বিশেষজ্ঞের কাছে লেখা পাওয়ার অনুরোধ জানালে প্রতি-উত্তরে ছিল ভণিতাবিহীন এই প্রশ্ন— পুনরায় কেন রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যাবতীয় কথা হয়ে গিয়েছে তাঁর, অকপটে জানিয়ে বলেছেন— নতুন কিছু বলার অবশেষ নেই আর। প্রাগুক্ত ব্যক্তি একা নন, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক-ই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে (অনেকের আবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত 'সিরিয়াস' সব কাজ আছে, জনপ্রিয় বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রের উত্তর-সম্পাদকীয়-তে সুবিধামতো রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির বাণ ডেকে আনেন অনেকে।) একটা গোটা প্রবন্ধ লিখতে আর তেমন করে তাগিদ অনুভব করেন না আজকাল। কারণ হতে পারে, বছর-বছর শত-সহস্রাধিক রবীন্দ্র-গবেষণার নামে গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি, 'থোড় বড়ি খাড়া'-জনিত উদ্রিক্ত বিরক্তি; অ্যাকাডেমিক সিলেবাসে রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তি এবং তজ্জনিত পাহাড়প্রমাণ অকল্পনীয়, অনৈতিহাসিক পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাখ্যাঠাসা রবীন্দ্রসহায়িকা প্রসূত মূর্খতার আস্ফালনে প্রকটিত চিন্তার দৈন্য; সাহিত্যের, সমাজকর্মের অপরাপর ক্ষেত্র ছেড়ে একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের গণতন্ত্রকরণ, সেই সূত্রে বাজারকরণ অর্থাৎ ট্রাফিক সিগনাল থেকে নেটফ্লিক্সের সিরিজে অ্যাডাপ্টেশনে রবীন্দ্রনাথকে Culture Industry-র অন্যতম উপাদানে পরিণত করা এবং অবশ্যই গুরুদেব ভক্তদের বাৎসরিক পৌত্তলিক পার্বণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, চিন্তক, সমাজদার্শনিককে প্রায় দেবত্বে সমাসীন করার প্রচেষ্টায় স্থূল-ভাবাবেগ চর্চার প্রকাশ— সব মিলিয়ে জনপ্রিয় একমাত্রিক-বলয় ভেদ করে রবীন্দ্রনাথকে বারে বারে ফিরে দেখা, সময়ের সঙ্গে পড়ে দেখা, তাঁর দর্শনের সঙ্গে পারস্পরিক কথোপকথনে ব্যক্তি তথা সামাজিক অস্তিত্বের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া থেকে বিরত আমরা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে পুনর্বার কথা বলার সময় ফুরিয়েছে অনেকের, এমনকি রবীন্দ্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রজ্ঞাবানের!

আমরা অবশ্য এমনটা ভাবলাম না। ভাবলাম এখনের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পড়েই দেখি না। তাঁর শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র তথা অর্থনৈতিক ভাবনাকে এই সময়কালে প্রতিস্থাপিত করে বুঝে নিতে পারি আমরা। আজকের হিংসায়, ঘৃণায় উন্মত্ত, বৈষম্য-শোষণে উৎপীড়িত, প্রকৃতির অনিঃশেষ ক্ষয়ে মৃত্যু-

আকীর্ণ প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ কী আমাদের ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনচর্যা তথা পরিচালনার ক্ষেত্রে পুনরায় নতুন দিশার সন্ধান দিতে পারবেন? অনিবার্য অপরিহার্য সেই পথের খোঁজ করতে অভিক্ষেপ পত্রিকা ১৪৩২ বঙ্গাব্দের উৎসব সংখ্যায় দ্বারস্থ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সংযোগসাধক মানবভাবনার পরিসরে। পত্রিকার 'এখন রবীন্দ্রনাথ' সংখ্যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল পুনশ্চ।

ধন-সম্পদের অসম বণ্টনে অভূতপূর্ব বৈষম্যের মুখোমুখি পৃথিবী। এ বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা, অর্থাৎ ৩৬০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি রয়েছে, পৃথিবীর ৮ জন ধনকুবের সমপরিমাণ সম্পত্তি কুক্ষিগত করে রেখেছে। অক্সফ্যামের রিপোর্টে ভারতের বৈষম্যের ছবি আরও অশ্লীল। দেশের ৫৮ শতাংশ সম্পদ রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ ধনীর দখলে। জি-২০ গোষ্ঠীর একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে ২০০০-২০২৩ সালের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পত্তি ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিউনিস্ট শাসিত চিনে এই হার ৫২ শতাংশ। বলা বাহুল্য দৈত্যপুঁজি মুখব্যাদান করে গিলে খাচ্ছে অপাঙ্‌ক্তেয় জনসাধারণের 'অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক'। শুধু কী তাই! জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর উন্নয়নকে একমাত্র মডেল ধরে মূলনিবাসী মানুষের জল-জমি-জঙ্গল দখল করে চলছে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন! অ্যানথ্রপোসিন যথেচ্ছাচার পৃথিবীর বুকে কায়েম করতে চাইছে পণ্যক্ষুধার রবরবা। 'লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর' স্তূপীকৃত 'নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী' 'নব সভ্যতার' মূলে যে ছিল 'ধনগরিমার ইতরতা'– সাম্রাজ্যবাদীর চোখে চোখ রেখে সে কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানব-উন্নয়নে বিকল্প সমবায়িক অর্থনীতি, তা রূপায়ণে ব্যক্তির আত্মনির্মাণ ও রূপান্তরের নিরলস প্রয়াসের কথা বলেছেন তিনি। এবং বাস্তব কর্মোদ্যোগে শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মানুষের সক্ষমতায়, তাদের গণনৈতিকতার রাজনীতিকতায় চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের বিপরীত এক সমাজভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজকে যখন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য-চাহিদা অনুযায়ী টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের পল্লিগঠনের সাংগঠনিক কার্য ও আত্মিক ভাবাদর্শের অনুধাবন এবং উপলব্ধি— উন্মত্ত-উন্নয়নমুখী, অবিমৃশ্যকারী, অপরিণামদর্শী সময়ে অত্যাবশ্যক কর্তব্য। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

> মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।
>
> [*সভ্যতার সংকট*]

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অসহনীয় ক্ষুধা, ক্রয়যোগ্য শিক্ষা ও আরোগ্যের অ-বাসযোগ্য পৃথিবীতে কর্মহীন, চালচুলোহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপন্ন অস্তিত্বের

মানুষদের বিপক্ষে বহুল ব্যবহৃত অস্ত্রে রাষ্ট্র তাদের মধ্যে প্রতিকারহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা ক্রোধ, ক্ষোভকে বিপথে চালিত করে। এই সময়ে মৌলবাদী ধর্মান্ধ মানসিকতা, স্বাজাত্যভিমানী আধিপত্যকামিতাকে হাতিয়ার করে সমগ্র পৃথিবীর দক্ষিণপন্থী শাসক জনগণকে উগ্র-জাতীয়তাবাদে উন্মাদিত করে চলেছে। স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা পৃথক হয়ে পড়েছে। 'অপর'-বর্গকে শত্রু বানানো উগ্রচণ্ড, সরকারি জাতীয়তাবাদের ভাষ্যে দমিত হচ্ছে সংখ্যালঘু, অভিবাসী, শরণার্থী সহ ভিন্ন-যৌনতার মানুষ। এক দেশ, এক ভাষা, এক সংস্কৃতিতে সবাইকে শামিল হতেই হবে। 'বৈচিত্র্য' ছেড়ে 'অপর' অবনত হও। নতুবা সার্জিকাল স্ট্রাইক মুহুর্মুহু আছড়ে ফেলবে স্টর্মট্রুপার থেকে ট্রোলাস্ত্র।

সর্বগ্রাসী সৌজাত্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি রবীন্দ্রনাথ। নিঃসঙ্গ হয়েছেন, তবু জাতীয়তাবাদের উত্তুঙ্গ পরিবেশে Nationalism-কে 'মাংসাশী', 'স্বগোত্রভোজী', নখদন্তবিস্তারী বর্বর, বিভীষিকা– 'মানবপীড়নের মহামারী' বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। সত্য কঠিন হলেও অবিচল ছিলেন সত্যের অর্হণায়। তিনি স্বদেশ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন অন্তরের সাধনায়। দেশকে যেখানে নিত্য গড়ে তুলতে হয় আত্মশক্তিতে, সহযোগে, সাহচর্যে। স্বদেশি সমাজ গঠনের উপরে জোর দিয়েছেন। মনে করেছেন, বাইরের উল্লাস, আড়ম্বরে দেশ অনায়ত্ত থেকে যায়; পল্লিগঠন তথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যেই দেশবাসীর অগ্রগতি সম্ভব; রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমত্ব মূলত সংহারমূলক বলে মেনেছেন তিনি। রাষ্ট্রশক্তির নির্ঘোষের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিলেন আত্মশক্তির অনুপ্রেরক তিনি। ভারতবর্ষের দুর্গতির মূলে যে 'অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ' দায়ী, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে আমাদের সাবধান করেছেন। আমরা আমাদের ঘরের চারপাশের প্রকৃতি, তথা আমাদের পড়শি ডোম, কৈবর্ত, বাগ্‌দি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। পারম্পর্যক্রমে চলে আসা ব্রহ্মাবর্তের 'আচার'-কে 'সদাচার' মেনে আমাদের 'চিত্তের স্বাধীনতা'-কে প্রচলিত সংস্কারের জিম্মায় আত্মসমর্পণ করে জাতের বিচারে, ধর্মের প্রাচীর তুলে, ঘৃণার বিষে জাত-গরিমার অভিমানকে পরিপুষ্ট করেছি বলে তাঁর মত। কবির দেশপ্রতিমার আসন আপন আরসে পাতা। ভারতীয় 'ভূমা'-র সমন্বয়ধর্মী বহুর ভাবসাধনায়, বাউল দর্শনের সহজমানুষ যোগে রবীন্দ্রনাথের দেশমাতৃকার অভিষেক। সেই মাতৃমন্ত্রে সবার আহ্বান—আর্য-অনার্য শুচি-অশুচি হিন্দু-মুসলমান; সবাকার। সবাই ধরবে সবার হাত; মা যে আমাদের আনন্দময়ী।

বৃহতের তথা যুক্তসাধনার বিশ্বমানস রবীন্দ্রনাথ সমন্বিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন এই সময়। সাড়া হোক তাই তাঁর কর্ম-ভাবনার নিবিড় অনুশীলনে। রবীন্দ্রনাথ থাকুন পাশে, মুখোমুখি; প্রতর্কে দ্বিরালাপে...।

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের প্রারম্ভে বিমলাকে বলতে শোনা যায়–

> স্বদেশি কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশকে সেবা করতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এ-বছর ‘বন্দেমাতরম’ গানের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল। ক্ষমতাসীনের নির্দেশে শুধু প্রথম দু-টি স্তবক নয়, পুরো গান গেয়েই বঙ্কিমচন্দ্র রচিত মাতৃমন্ত্রে নন্দিত, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন-স্পন্দিত, এই জাতীয় সংগীতের হৃত গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিতর্কের সূত্রপাত ১৯৩৭-এর ২৮ অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে, সুভাষচন্দ্র-জওহরলালের সমর্থনে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে সম্পূর্ণ গানটি নয়, প্রথম দু-টি কলিই সভ্য সমিতিতে গীত হবে। কেননা, মুসলিম সভ্যদের পক্ষ থেকে এই স্তোত্রের শেষের স্তবকগুলি সম্পর্কে প্রবল আপত্তি জানানো হয়: কেননা স্তবকগুলি ছিল পৌত্তলিকতায় পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথ দুর্গার স্তব তথা মাতৃপূজার আরাধনামূলক স্তবককে জোর করে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি চাননি যে, সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের সম্মেলনস্থল রাষ্ট্রসভায় সর্বজনীনভাবে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গত হোক; গোঁড়ামির জেদে যেন আমরা দেশমাতৃকার বন্দনাস্তোত্র ‘বন্দেমাতরম’-কে ‘বন্দে মারতম’-এর হানাহানিতে পর্যবসিত করে ফেলি।

এই সময় তরুণ বুদ্ধদেব বসু রচিত ‘গান না শ্লোগান’ প্রবন্ধ সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত করে বুদ্ধদেবকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত জানিয়েছেন—

> ...ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান— এমনকি ব্রাহ্মও শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও, ‘ত্বং হি দুর্গা’, ‘কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু নামধারিণীদের স্তব,... গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করতেই হবে। হিন্দুদের পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু, যাদের ধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ, তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই।

সর্বগ্রাসী ক্ষমতাধিপত্যময় স্বাজাতিকতার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল ঋজু, অটল। দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে হুজুগে মাতামাতির ঊর্ধ্বে তিনি সর্বাঙ্গীণ লোকহিতের সপক্ষে দাসত্বের-চেতনা-উত্তরিত আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বলেছেন—

> আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।
>
> [*সভ্যতার সংকট*]

শাসকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাই বরাবর অস্বস্তিকর; সার্বভৌমত্বের অধীনে তাঁকে রাষ্ট্রভুক্ত করা যায় না বলেই হিন্দু-মুসলিম উভয় মৌলবাদই কবির গানের ওপর আক্রমণ শানায়। কোথাও তিনি বিধর্মী, কোথাও বা তাঁর গান দেশদ্রোহের পরাকাষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সর্বদাই মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন। মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশে আস্থাবান তিনি স্থিরনিশ্চয়—

> এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ...।
>
> [*সভ্যতার সংকট*]

সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথ ঘরে-ঘরে প্রস্তুতির ডাক দিয়ে যান। এবং বলে যান জনগণ নিজেরাই পারবে 'আত্মশাসন-শক্তি' উদ্ভাবন করতে। আত্মনির্মাণের সেই কাজ একইসঙ্গে ব্যক্তিক ও সমবায়ী। প্রতিদিনের।

এখনও তাই রবীন্দ্রনাথ।

পয়লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ — সুশান্ত পাল

সভ্যতার সংকট
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত— তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে